History and Heritage, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010006

‘দাসিয়ারছড়া’ ছিটমহলের ইতিবৃত্ত

(Cronicle of the ‘Dasiar Chhara’ Enclave)

মুহাম্মদ ওমর ফারুক*
আমজাদ হুসাইন**

Abstract

Before 2015, ‘Dashiar Chhara’ was an Indian enclave. Although officially this enclave was a part of Dinhata sub-division of Cooch Behar district under the West Bengal province of India; in reality the geographical location of this enclave was inside Bangladesh. This enclave was located between the cities of Lalmonirhat and Kurigram district of Bangladesh and on the north-eastern bank of the Dharla River within the Fulbari police station of Kurigram district. Out of 162 interchangeable enclaves between India and Bangladesh, this Dashiar Chhara enclave was full of distinctive features. Its area was much larger than other enclaves and the number of people was relatively high. Therefore, the evolution of this enclave will undoubtedly be regarded as a fascinating chapter for the history savvy reader.

মূল শব্দঃ দাসিয়ারছড়া, ছিটমহল, ভারত, বাংলাদেশ

ভূমিকা

ছিটমহল সম্পর্কিত আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে যদিও অর্বাচীন, কিন্তু ছিটমহল প্রসঙ্গটি বেশ পুরোনো এবং প্রাচীন সমস্যাবহুল একটি বিষয়। এমনকি ছিটমহলের উৎপত্তি বা আবির্ভাবের বিষয়টিও খুব রহস্যজনক। ছিটমহলের আবির্ভাব নিয়ে নানামুনির নানা মত প্রচলিত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছিটমহলগুলির সমস্যাহীন উৎপত্তি হয়েছিল মুঘল-কোচ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে।[১] আবার প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী ছিটমহলগুলির সুত্রপাতের পেছনে রয়েছে নানান রহস্য। কেউ কেউ মনে করেন যে, কোচবিহারের রাজা ও রংপুরের রাজার মধ্যে নানা ধরণের খেলাধুলা এবং খেলাধুলা সংক্রান্ত পরাজয় ও পরাজয় হেতু একে অপরকে ভুমি প্রদানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ছিটমহলগুলি।[২] আবার অনেকে এরকম ধারণাও পোষণ করেছেন যে রংপুর বা কোচবিহারের রাজকীয় শিকারি শিকারের পেছনে ধাওয়া করে যে স্থানে শিকার সম্পন্ন করতেন সে স্থানটি পূর্ব শর্তানুসারে শিকারিকে প্রদান করা হত এবং তা শিকারির রাজ্যের অংশে পরিণত হতো।[৩] তবে ছিটমহলগুলি প্রথম দিকে ছিল সমস্যা বর্জিত। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে ছিটমহলগুলি স্বতন্ত্রতা লাভ করে এবং এটাই ছিল ছিটমহলগুলির সমস্যার বীজ বপনকাল। একথা সর্বজন বিদিত যে, ছিটমহলজনিত সমস্যা প্রকট আকার

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ই-মেইলঃ omorfaruq@du.ac.bd
** সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ই-মেইলঃ amzadhussain88@gmail.com

ধারন করেছিল ১৯৪৭ পরবর্তী জামানায় ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর, যখন বঙ্গের পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরিত হয়। ছিটমহল সমস্যা আরো তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে ঠিক তখন, যখন দেশীয় রাজ্য কুচবিহার ১৯৪৯ সালে ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। এসময় থেকে ছিটমহল সমস্যা জটিল ও দ্বিপাক্ষিক সমস্যায় পরিণত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ছিটমহল সমস্যা ছিল পাক-কোচ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সালে পর্যন্ত এ সমস্যা ছিল ইন্দো-পাক দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। কিন্তু ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে ছিটমহল সমস্যারও রূপান্তর ঘটে। এসময় থেকে ভারত-পাক ছিটমহল সমস্যাটি ইন্দো-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে দাসিয়ারছড়া ছিটমহল সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ছিটমহলগুলির উত্থানের ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও ছিটমহলগুলি সমস্যাবহুল হয়ে উঠেছিল ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ পরবর্তী বছরগুলিতে। ভারতের স্বাধীনতা, ভারত বিভক্তি এবং ভারতের সঙ্গে কোচবিহারের অর্ন্তভুক্তি ছিটমহল সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই বলা যায় যে, ছিটমহল সমস্যা প্রকট হয়ে উঠে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো; সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা কবি সাহিত্যিক এবং গবেষকগণও বিংশ শতকের অন্তিম লগ্নেও ছিটমহল সমন্ধে তেএ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মূলত: একবিংশ শতকের দিকে ছিটমহল সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও লেখালেখি শুরু হয়। এ সময়কালে যে সকল গবেষণালব্ধ লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলির অধিকাংশই ভারত ও বিদেশী গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ২০০১ সালে প্রকাশিত অলোক গুপ্ত ও স্বাতী চন্দের "*India and Bangladesh: Enclaves Dispute*" গ্রন্থটি। বাংলাদেশ ও ভারতের কোচবিহারের সীমারেখায় অবস্থিত ছিটমহল সম্পর্কে একক কোন রচনা হচ্ছে Whyte, Brendan R. রচিত মেলবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "*Waiting for the Esquimo: An Historical and Documentary Study of the Cooch Behar Enclaves of India and Bangladesh* গ্রন্থটি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত Willem Van Schendel-এর "*Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves*" এ গ্রন্থ দুটিই ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। ২০১১ সালে দেবব্রত চাকী রচিত কলকাতার সোপান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা পুস্তকের নাম "ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল"। *Journal of South Asian Studies* এর ২০১৪ সালের ২য় সংখ্যায় এ বিষয়ে Md. Azmeary Ferdoush-এর "Rethinking Border Crossing Narratives: A Comparison between Bangladesh-India Enclaves"একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *South Asia Multi Disciplinary Academic Journal*-এর ২০১৪ এর অক্টোবর সংখ্যায় Jason Cons রচিত "Impasse and Opportunity: Reframing Postcolonial Territory at the India-Bangladesh Border শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২০১৬ সালে Hosna J Shewly রচিত "*India and Bangladesh Swap Territory Citizens in Landmark Enclave Exchange*"। ২০১৯ সালে R.K Barman রচিত নিউ দিল্লী থেকে প্রকাশিত "*The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh*" (A Historical Study)। Anamika Roy রচিত "Women's, Marriage and Migration in the Bangladeshi Enclaves in the India- Bangladesh Borderland" প্রবন্ধটি ২০২৩ সালে *India Quarterly*-তে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ঢাকা থেকে

প্রথমা প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী-এর *'বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল: অবরুদ্ধ ৬৮ বছর'* গ্রন্থটি ভারত বাংলাদেশের মধ্যকার ছিটমহল-এর বিষরে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

উপরোক্ত গবেষণাপত্র এবং গ্রন্থগুলি কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে ছিটমহল বিনিময়ের পূর্বে এবং কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে ছিটমহল বিনিময়ের পরে। এদের অনেকে বিদেশী আবার কেউ বা অনেক দূর থেকে এক দুটি ছিটমহল পরিদর্শন করে এবং এক দু'জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে কিছু অনলাইন ভিত্তিক তথ্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এদের অধিকাংশই ছিটমহলের মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেলামেশা করেননি; তাদের লেখা পড়ে তা প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও এদের লেখাগুলির বেশীরভাগই সামগ্রিকভাবে সকল ছিটমহলকে নিয়ে রচিত। সেক্ষেত্রে আমরা মোট বিনিময়যোগ্য **১৬২** টি ছিটমহলের এক চতুর্থাংশ ছিটমহল পরিদর্শন করতে সমর্থ হয়েছি। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছিটমহলে আত্মীয়তার সূত্র থাকায় ছিটমহলে রাত্রী যাপন ও ছিটমহলবাসীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেলামেশা করতে সমর্থ হয়েছি। এতদ্ভিন্ন এ গবেষণা পত্রটি শুধুমাত্র একটি বিশেষ ছিটমহলকে নিয়ে লেখা। তাই এ গবেষণায় বৃহৎ বৃত্তের পরিবর্তে ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে সীমিত রেখে অধিকতর পর্যবেক্ষণ সহকারে কাজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, 'দাসিয়ারছড়া' ছিটমহলটির গণপ্রজাতান্ত্রিক বিষয়টি তেমনএভাবে পূর্বে কোন গবেষক তুলে ধরতে সমর্থ হননি। আমরা এ বিষয়টি অত্যন্ত সত্যনির্ভতার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান নিবন্ধের মাধ্যমে প্রথমত, উল্লেখিত 'দাসিয়ারছড়া' ছিটমহলটির অবস্থান ও পরিচয় তুলে ধরা হবে, এর সাথে এটির বিবর্তন ইতিহাস, অন্যান্য ছিটমহল থেকে এটির স্বতন্ত্রতা, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী 'দাসিয়ারছড়া'-এর বাসিন্দাদের বিশেষ সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার প্রয়াস পাব। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে ভারতীয় সাবেক ছিটমহল দাসিয়ারছড়া সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় সাধারণ জণগনের সামনে তুলে ধরা এবং সমাজ গঠণে জাত-পাত নির্বিশেষে সামগ্রিক প্রয়াস যে অতি জরুরী তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে। তৃতীয়ত, **১৯৪৭** সালে দেশ ভাগের পর থেকে পাকিস্তান থেকে ভারতের দিকে যে উদ্বাস্তুর ঢল লক্ষ্য করা গেছে তার প্রচলিত সাম্প্রদায়িক কারণের চেয়েও অর্থনৈতিক কারণই যে অধিক দায়ী ছিল, সে বিষয়টি বাস্তবসম্মত যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হবে। সর্বোপরি, গবেষণা পত্রটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়কে তুলে ধরা এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অবদান রাখা, যা যে কোন দেশ বা জাতিকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ছিটমহল পরিচিতি

'ছিট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ক্ষুদ্র অংশ; এবং এ ক্ষুদ্রাংশ অধিকাংশ সময়েই অপর বৃহৎ পরিবেশ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বা অবস্থানের সমন্বয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজের অবস্থানকে প্রকাশ করে। চারিদিকে জল মধ্যখানে ভূখণ্ড, যা ভূগোলে দ্বীপ নামে পরিচিত, পৃথিবীর মানচিত্রে এরকম দ্বীপের সংখ্যা অগণিত। চারিদিকে অন্য দেশের ভূখণ্ড, মাঝখানে ছোট্ট দেশের অস্তিত্বও বিরল নয়। উদাহরণ হিসেবে ইটালির ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত 'ভ্যাটিকান সিটি' ও 'স্যানমেরিনো' এর কথা বলা যেতে পারে। এছাড়াও 'লিসোথো'

নামক স্বাধীন দেশটি দক্ষিণ আফ্রিকার ভূখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিশেষজ্ঞগণ এ সকল দেশকে "Enclaved Country" নামে অভিহিত করে থাকেন।[৪]

অভিধানে 'ছিট' বলতে একরকম অর্থে বোঝায়, টুকরো বা বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে 'ছিট জমি' অর্থে ভিন্ন মৌজার জমিকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'মহল' শব্দটির একরকম অর্থ হয় ভূসম্পত্তির অংশ বা তালুক। এ থেকে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি যে, 'ছিটমহল' হল বিচ্ছিন্ন কোনও তালুক বা মৌজা। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তির বিচ্ছিন্ন অংশই হল 'ছিটমহল'।[৫] বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আয়তনের ছিটমহলের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। যদিও সব ছিটমহলের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য একরকমের নয়। সাহিত্যিক অমর মিত্র (জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) ছিটমহলকে অন্যভাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, 'ছিটমহল হল দেশের ভিতরে বিদেশ আবার বিদেশের ভিতরে দেশ।[৬]

এ Enclave বা ছিটমহলের অস্তিত্ব শুধু যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত তা নয়; ১৯৬৬ সালে বেলারুসের অভ্যন্তরে অবস্থিত লিথুনিয়ার ছিটমহল পোজির বিনিময়ের পর এবং ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি বিনিময়ের পূর্ব পর্যন্ত সারা বিশ্বে সর্বমোট ২৫৬ টি ছিটমহলের অস্তিত্ব ছিল। এর মধ্যে ৩২টি ছিটের মধ্যে ছিট এবং একটি ক্ষেত্রে ছিটের মধ্যে ছিট এবং তারই মধ্যে ছিট।[৭] এ ছিটগুলি ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মোট ১৭টি দেশের খণ্ড খণ্ড এলাকা যা উভয় মহাদেশের মোট ১৫টি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এ ১৭ টি দেশের মধ্যে ইউরোপে অবস্থিত ১৩টি দেশ হলঃ অস্ট্রিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, ইতালি, উজবিকিস্তান, কিরঘিস্তান, তাজিকিস্তান, জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, স্পেন, সাইপ্রাস ও রাশিয়া। অপরদিকে এশিয়ায় অবস্থিত মোট ৪টি দেশ হলঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ভারত ও বাংলাদেশ।[৮]

ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে ছিটমহল সমস্যা ছিল একটু ভিন্নধর্মী। অর্থাৎ দুটি দেশেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ভূখণ্ড উভয় দেশের ভূখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। এগুলিকে Enclave বা ছিটমহল বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ছিটমহল কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, ১৫২৬ সালে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত মাদ্রিদ সন্ধিপত্রে।[৯] ইংরেজি ভাষায় Enclave শব্দটির প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে।[১০] Enclave ছাড়াও আর একটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা Exclave নামে পরিচিত। এ Exclave শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১৮৮৮ সালে।[১১] কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন অপর রাষ্ট্রের Enclave যদি প্রথম রাষ্ট্র দ্বারা জোর পূর্বক দখল করে ভোগ করা হয় তখন তা উক্ত রাষ্ট্রের Exclave বলে পরিগণিত হয়। উদাহারন স্বরূপ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্পেনের গ্রাম লিভিয়ার কথা বলা যেতে পারে; একইসময়ে লিভিয়া যেএ ফ্রান্সের Exclave, সমভাবে স্পেনের Enclave হিসেবে পরিগনিত। এছাড়াও আজারবাইজানের 'নাখিচেভান' (Nakhichevan) এমন একটি Enclave যা, আর্মেনিয়া, ইরান ও তুরস্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরকম আর কোন Enclave এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ছিটমহল উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছিটমহলের উৎপত্তির ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন। ভারত (কোচবিহার) ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ১৬২ টি ছিটমহল যা, ২০১৫ সালে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হয়েছিল,[১২] সেগুলির উৎপত্তি ও আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে,

এ দু'দেশের মধ্যকার ছিটমহলগুলির উৎপত্তির ইতিহাস রহস্যাবৃত এবং চমকপ্রদ। এ ছিটমহলগুলির উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক নানাবিধ বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। ছিটমহলগুলির উৎপত্তি নিয়ে মূলত: তিনটি ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

শিকার সংক্রান্ত বিশ্লেষন : বিভিন্ন গবেষক লোকশ্রুতির উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনামলে কোচবিহার রাজা ও বঙ্গীয় ইংরেজ শাসকের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি ছিল। এ চুক্তি অনুসারে ইংরেজ শাসক ও তাদের অধস্তন কর্মচারীরা শিকারের পিছু ধাওয়া করে যদি কোচবিহার রাজ্যের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ত এবং শিকারে সফল হত, তবে ঐ ভূখণ্ড শিকারির কতৃপক্ষের অধীনে চলে যেত। অনুরুপভাবে কোচবিহারের রাজা বা রাজার অধঃস্তন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারি শিকারের পশ্চাদাবন করে ব্রিটিশ ভারতের কোন স্থানে শিকার সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে উক্ত স্থান শিকারি তথা শিকারির কতৃপক্ষের অধিনে চলে যেত। এভাবে ব্রিটিশ বঙ্গ তথা ব্রিটিশ ভারতের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড কোচবিহার রাজ্যের খতিয়ান ভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে কোচবিহার রাজ্যের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ব্রিটিশ বাংলার খতিয়ান ভুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল।[১৩] তবে এ ধরনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ কোন ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

খেলাধূলা সংক্রান্ত তত্ত্ব: জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে অনেক গবেষক ছিটমহল উৎপত্তির চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেছেন। ভারতে ঔপনিবেশিক আমলে কোচবিহার রাজ কতৃপক্ষ এবং ব্রিটিশ শাসকদের বিভিন্ন স্তরের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা ধরনের খেলা বিশেষত পাশা বা দাবা খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত, উক্ত খেলায় যে পক্ষ পরাজিত হত, সে পক্ষ অপর পক্ষকে নিজ রাজ্য বা ভূখণ্ডের ক্ষুদ্র অংশ বিজয়ী পক্ষকে হস্তান্তর করত। এভাবে উভয় অঞ্চলের শাসক উভয় রাজ্যের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল নিজ রাজ্য বা নিজ শাসনাধীন ভূখণ্ডের খতিয়ানভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।[১৪] তবে এ ধরণের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণেরও কোন ঐতিহাসিক দলিল বা সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। সঙ্গত কারণে এধরণের বিশ্লেষণকে ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মুঘল-কোচ সংঘাত: মুঘল-কোচ সংঘাত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে অবশ্যই একটু ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ প্রয়োজন। আজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের যে জেলাটি কোচবিহার নামে পরিচিত, তা ১৯৪৯ সালের পূর্বে একটি দেশীয় রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে কোচ রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস মণ্ডল হলেও এ রাজবংশের প্রথম স্বনামধন্য রাজা ছিলেন হরিদাস মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশু বা মহারাজা বিশ্বসিংহ। মহারাজা বিশ্বসিংহ এবং তার পুত্র নরনারায়ণের (১৫৩৩-১৫৮৭) আমলে কোচবিহার রাজ্যের সীমানা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যেই অবশ্য দিল্লীতে জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবুরের নেতৃত্বে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সম্রাট বাবুর এবং হুমায়ুন সময় ও সুযোগের অভাবে বাংলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে না পারলেও আকবরের আমলে মুঘলরা বাংলাদেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে নরনারায়ণের পরবর্তী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (১৫৮৭-১৬২৭) আমলে সাম্রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মুঘল-কোচ দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠে।[১৫] তবে লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরবর্তী রাজা বীরনারায়ণের (১৬২৭-১৬৩২) আমলে মুঘল-কোচ দ্বন্দ্ব সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও বীর নারায়ণের পুত্র প্রাণনারায়ণের (১৬৩২-১৬৬৫) আমলে মুঘল-কোচ দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রাণনারায়ণ তাঁর রাজত্বের অন্তিম পর্বে (১৬৫৮) সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে মুঘলরা বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রংপুরের ঘোড়াঘাট পর্যন্ত নিজ সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত করে।[১৬] ভ্রাতৃ-কলহের নিরসন ঘটলে আওরঙ্গজেব

সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর আওরঙ্গজেব নবনিযুক্ত বাংলার সুবাদার মিরজুমলা খাঁকে প্রাণনারায়ণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দেন।[১৭] মিরজুমলা ১৬৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে কোচবিহার আক্রমণ করলে কোচ রাজা প্রাণনারায়ণ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। মিরজুমলা অনায়াসে কোচবিহার দখল করে নেন এবং কোচবিহারের নতুন নামকরণ করেন, 'আলমগীর নগর'। ইস্ফান্দিয়ার বেগকে আলমগীর নগরের নতুন শাসক নিযুক্ত করা হয়।[১৮] অতঃপর মিরজুমলা কোচবিহার ত্যাগ করে অহম রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন।

মিরজুমলা কোচবিহার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহারের জনসাধারণ মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে এবং বড় ধরণের বিদ্রোহে যোগ দেয়। সুযোগ বুঝে প্রাণনারায়ণ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। এতে বিদ্রোহীদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং ইস্ফান্দিয়ার বেগসহ মুঘল প্রশাসনিক পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। এ ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে মিরজুমলা মৃত্যু মুখে পতিত হলে মুঘল বাংলার নতুন সুবাহদার হন শায়েস্তা খান।[১৯] শায়েস্তা খানের সামরিক প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। তাই কোচ রাজা প্রাণনারায়ণ শায়েস্তা খানের সঙ্গে সংঘাতের পরিবর্তে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হন এবং এ মর্মে একটি পত্রও প্রেরণ করেন।[২০] ইতিমধ্যেই অবশ্য ঘোড়াঘাটের (ইদ্রাকপুর) মুঘল সর্দার আসকর খান কোচ রাজ্যে প্রবেশ করে ফতেহপুর চাকলা দখল করে নেন। যা হোক, কোচ রাজের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খান এবং প্রাণনারায়ণের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির পর কতিপয় বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা বাদ দিলে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত মুঘল-কোচ সুসম্পর্ক অব্যাহত ছিল।[২১]

১৬৬৫ সালে কোচ রাজা প্রাণনারায়ণ-এর মৃত্যুর পর কোচ রাজ্যে গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হয়।[২২] সেই সুযোগে ঘোড়াঘাটের মুঘল সর্দার ইরাদৎ খান প্রতিশ্রুত পেশকাস (খাজনা) বকেয়া থাকার অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে সামরিক অভিযান চালিয়ে চাকলা কাকিনাকে অধিকার করে মুঘল বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন।[২৩] রাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচ রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কলহ শুরু হয়েছিল তা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এসময় চেয়ার খেলার চেয়ারের ন্যায়, অনেকেই সিংহাসন নামক চেয়ারটির স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রাণানারায়নের পর মোদনণারায়ন (১৬৬৫-৮০), বাসুদেব নারায়ণ (১৬৮০-৮২) এবং ১৬৮২ সালে মহিন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়। ১৬৯৩ সালে রাজা মহিন্দ্রনারায়ণের অকাল মৃত্যুতে কোচ রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এ বিশৃংখলময় পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে যজ্ঞনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ নাজিরদের শান্তনারায়ণের সহায়তায় ১৬৯৩ সালে কোচ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহন করেন। রূপনারায়ণ সামরিক শক্তিতে সুকৌশলি ছিলেন। তিনি ভুটানের রাজা দেবরাজের সহায়তায় কোচবিহার রাজ্যের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারে মুঘলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর অবশেষে মুঘল ফৌজদার আলিকুলি খাঁ এবং কোচ রাজা রূপনারায়ণের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এচুক্তি অনুযায়ী ৬টি বিতর্কিত চাকলার মধ্যকার দক্ষিণাংশের তিনটি চাকলা, যথাঃ কাকিনা, কার্যীরহাট এবং ফতেপুর-এর উপর মুঘলদের প্রভাব বজায় থাকে। অপরদিকে, চাকলা পাটগ্রাম, পূর্বাভাগ এবং বোদা' এর উপর কোচবিহার রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪]

উপরোক্ত সমঝোতা চুক্তির শর্ত ঢাকার নাজিমের এপুত না হওয়ায়, নাজিম আলিকুলি খাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে তদস্থলে নেয়ামতুল্ল্যা খাঁকে (১৭১১) স্থলাভিষিক্ত করেন। নেয়ামতুল্ল্যা নতুন পদে অধিষ্ঠিত হয়েই, পাটগ্রাম, পূর্বাভাগ, এবং বোদা'র উপর মুঘলদের কর্তৃত্ব দাবি করেন এবং কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধে

অগ্রসর হন। রাজা অনায়াসেই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং চাকলা তিনটির উপর মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরেও বেশ কিছু খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিও স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্তানুসারে চাকলা তিনটিতে বাদশাহী প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বাৎসরিক খাজনা দানের শর্তে ছত্র নাজীর কুমার শান্তনারায়ণ রাজপক্ষ থেকে ইজারা গ্রহণ করেন।[২৫] এ চাকলা তিনটির উপর বাদশাহী প্রভুত্ব থাকলেও খাতায় কলমে চাকলা পাটগ্রাম, পূর্বাভাগ এবং বোদা কোচবিহার রাজ্যের অংশ বলেই পরিগণিত হয়। যদিও এ তিনটি চাকলা থেকে মুঘলরা খাজনা আদায় করত। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কোচবিহার রাজ্যের দরবারীয় ঐতিহাসিক ও মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণের দেওয়ান খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ, উল্লেখ করেছেনঃ

> কোচবিহার রাজ্যের বর্তমান জমিদারী (১৯৪৭ সালে এর পূর্বে)-চাকলা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বাভাগের পূর্বাবস্থা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, উক্ত তিন চাকলার উপরে বাদশাহী প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার প্রারম্ভকাল হইতে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারের কিছুকাল পর পর্যন্ত উহা এক প্রকার অর্ধস্বাধীন রাজ্যের অনুরূপ অবস্থায় ছিল।[২৬]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান শাসনের অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত হয়; ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ এবং এরই সূত্র ধরে ১৭৬৫ সালে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলার দেওয়ানী লাভ ভারত তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক সুদূরপ্রসারী ঘটনা। দেওয়ানী লাভের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার এবং উড়িষ্যার অর্থনৈতিক তথা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করেছিল। অপরদিকে কোচবিহারের ইতিহাসের এক সুদূরপ্রসারী ঘটনা হল, ১৭৭৩ সালে ইঙ্গ-কোচ চুক্তি সম্পাদন।[২৭] রাজা রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহার রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ (১৭১৪-৬৩)। রাজা উপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহার রাজ্যের শাসন ক্ষমতা অনেকটা দূর্বল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ (১৭৬৩-১৭৬৫) এবং ধৈর্য নারায়ণের (১৭৬৫-১৭৭০) এর আমলে কোচবিহার রাজ্যের উপর ভুটানি আক্রমণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। রাজা ধৈর্য নারায়ণ একসময় ভুটানি বাহিনীর হাতে বন্দী হন।[২৮] রাজা বন্দী হলে নাবালক রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণের পক্ষে নাজীর দেও রাজা ধৈর্য নারায়ণকে উদ্ধার এবং ভুটানিদের উচিৎ শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইষ্টি-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও কোচবিহার রাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ১৭৭৩ সালে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-কোচ চুক্তি।[২৯] চুক্তির শর্তানুসারে কোচবিহার রাজ্য অর্ধ-স্বাধীন এবং কম্পানীর করদ রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। এভাবে কোম্পানী ১৭৬৫ এর দেওয়ানী লাভ এবং ১৭৭৩ এর ইঙ্গ-কোচ চুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহার রাজ্যের তিনটি চাকলা যথা, পূর্বাভাগ, পাটগ্রাম এবং বোদা'কে অধিকার করতে সমর্থ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চাকলা তিনটি কোম্পানী অধিগ্রহণ করলেও এ তিনটি চাকলাকে 'হস্তবুদ' (Assessment) প্রক্রিয়ার আওতার বাইরে রাখা হয়।[৩০] ফলশ্রুতিতে কোম্পানীর শাসনাধীন এ চাকলাগুলি খাতা-কলমে কোচবিহার রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে উল্লিখিত থাকে। কোম্পানীর হস্তবুদ প্রক্রিয়ার বাইরের এ চাকলাগুলি, রাজওয়ারা বা রাজগীর বলে পরিগণিত হয়। সময়ের পরিবর্তনে এ চাকলাগুলি রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অভ্যন্তরে কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৩১] ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে এবং বঙ্গের পূর্বাংশ পাকিস্তানে পরিণত হলে, রংপুর ও দিনাজপুরের বৃহৎ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে কোচবিহার রাজ্য ভারত সরকারের "Instrument of Accession" এ স্বাক্ষর করে ১৯৪৯ সালে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হলে রাজওয়ারা বা রাজগীর নামক চাকলাগুলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল বলে পরিচিতি লাভ করে। পরে

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হলে, রাজওয়ারা বা রাজগীর নামক অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল নামে পরিচয় লাভ করে।[৩২]

অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি তৈরির পেছনেও একটা সংঘর্ষজনিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। মহারাজা রূপনারায়ণের আমলে স্বাক্ষরিত মুঘল-কোচ শান্তি চুক্তির ফলে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খানে'র শাসনামলে কোচ-বাংলা সম্পর্ক অনেকটাই শান্তিপূর্ণ থাকে। কিন্তু রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর উপেন্দ্র নারায়ণের (১৭১৪-১৭৬৩) রাজত্বকালের শেষের দিকে নতুন বঙ্গীয় শাসক সুজাউদ্দিনের আমলে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিঘ্ন ঘটে। রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ অপুত্রক হওয়ায় দেওয়ান সত্যনারায়ণের পুত্র দীননারায়ণকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহন করেন। অতপর রাজা বার্ধক্যজনিত কারণে প্রশাসনের আংশিক দায়িত্ব দীননারায়ণের উপর অর্পন করেন।[৩৩] উচ্চাকাঙ্খী দীননারায়ণ এতে সন্তুষ্ট না হয়ে নবাবি বাংলার রংপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পালিত পিতার বিরুদ্ধে ফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।[৩৪] ষড়যন্ত্রের সূত্র ধরে এবং সুযোগের সৎব্যবহার করে রংপুরের ফৌজদার কোচ রাজ্য আক্রমণ করেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগে নাস্তানাবুদ রাজকীয় বাহিনী অনায়াসেই নবাবি বাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। ফৌজদার উপেন্দ্র নারায়ণের পরিবর্তে দীননারায়ণকে কোচবিহারের সিংহাসনে বসিয়ে কোচবিহার রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তাগত করেন।[৩৫]

দীননারায়ণের শাসন ও রংপুরের ফৌজদারের ক্ষমতা কোচবিহারে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ ভুটান রাজ দেবরাজের সহযোগিতায় কোচবিহারে প্রবেশ করেন। কোচবিহার নগরীর সন্নিকটে ধলুয়াবাড়ির নামক স্থানে নবাবি সৈন্য এবং রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৭৩৭)[৩৬]। এযুদ্ধে নবাবি সৈন্য চুড়ান্তভাবে পরাজিত হলে, দীননারায়ণ এবং সৈয়দ আহম্মদ কোনক্রমে রংপুরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। দীননারায়ণ এবং সৈয়দ আহম্মদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে নবাবি সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে কোচবিহার রাজ্যের দক্ষিণাংশে অনেক এলাকায় ঘাটি গেঁড়ে বসে। রাজকীয় সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করলেও পলাতক নবাবি সৈন্যের পশ্চাধাবন করতে সাহসী হয়নি। অপর দিকে ১৭৩৭ সালে পরাজয়ের পর কোচবিহার রাজ্যে আর কোন নবাবি আক্রমণ ঘটেনি। যে অঞ্চলগুলিতে নবাবি সৈন্য ঘাটি গেঁড়ে বসেছিল, সে অঞ্চলগুলি রাজকীয় সৈন্য উদ্ধারের জন্য আর কখনই চেষ্টা চালায়নি। ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলগুলি নবাবি সেনা সর্দারদের নেতৃত্বে শাসিত হতে থাকে। এ অঞ্চলের সেনা শাসকের শাসনে ও চাপে স্থানীয় বাসিন্দাগণ নবাবি শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এ অঞ্চলের জনগণ ও সেনা শাসক বাংলার নবাবকে নিয়মিত ভূমী রাজস্বও প্রদান করত। এ অঞ্চলগুলি কালক্রমে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে নবাবি বাংলা ও পরে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।[৩৭] ১৯৪৯ সালে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার "Instrument of Accession" এ স্বাক্ষর করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করলে উক্ত ছিটমহলগুলি কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে পাকিস্তানি ও পরে বাংলাদেশি ছিটমহল বলে পরিচিতি লাভ করেছিল।[৩৮]

ছিটমহল সংক্রান্ত মতসমূহের বিশ্লেষণ

ছিটমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে গবেষকগণ তৃতীয় ব্যাখ্যাকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তবে ছিটমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে তৃতীয় ব্যাখ্যাকেও অধিক নির্ভরশীল মনে করা যায় না। কেননা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছিটের ভেতর ছিট; আবার দুই একটি ক্ষেত্রে

ছিটের ভেতর ছিট আবার তারই ভেতর ছিট স্বাভাবিক ভাবেই তৃতীয় ব্যাখ্যার সার্বিক সত্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায় অবস্থান ছিল বাত্রিগাছ নামক একটি বাংলাদেশি ছিট-এর; যা বাংলাদেশের লালমনিহাট জেলার খতিয়ানভুক্ত ছিল। রহস্যের বিষয় হল বাত্রিগাছ ছিটের ভেতরে অবস্থান ছিল ভারতীয় ছিট মদনাকুড়া, যা, বাংলাদেশি ছিট বাত্রিগাছ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও ছিল।[৩৯] আর একটি উদাহরণ হল: বাংলাদেশি ছিট 'মধ্য মশালডাঙ্গা' কোচবিহারের দিনহাটা থানায় অবস্থিত ছিল; উক্ত বাংলাদেশি ছিটের মধ্যে অবস্থিত ছিল ভারতীয় ছিট ১৫৪ নং এসব শেওড়াকুরি।[৪০] একইরকম ভাবে কোচবিহারের শিতলকুচি থানায় অবস্থিত ছিল বাংলাদেশি ছিট নলগ্রাম; এটি বাংলাদেশি ছিট নলগ্রামে অবস্থিত ছিল ১৩৭ নং নলগ্রাম নামক একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় ছিট। ঠিক অনুরূপভাবে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত ছিল ভারতীয় ছিট দাসিয়ারছড়া। উক্ত ভারতীয় ছিট দাসিয়ারছড়ার মধ্যখানে অবস্থিত ছিল একটি বাংলাদেশি ক্ষুদ্র ছিট চন্দ্রকোণা; যা সম্পুর্ণরূপে ভারতীয় ছিট দাসিয়ারছড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[৪১] এ ছাড়াও আরোও চমকপ্রদ রহস্যময় ঘটনা হল ছিটের ভেতর ছিট, তারই ভেতর আবার ছিট। বাংলাদেশের দেবিগঞ্জ থানায় অবস্থিত ছিল একটি বেশ বড় রকমের ভারতীয় ছিট, যা বালাপাড়া খাগড়াবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। এ বালাপাড়া খাগড়াবাড়ি নামক ভারতীয় ছিটটির আয়তন ছিল-১৭৫২.৪৪ একর। এ ভারতীয় ছিটটির মধ্যে অবস্থিত ছিল উপেন চৌকি নামক একটি বাংলাদেশি ছিট। রহস্য এখানেই শেষ নয়; উপেন চৌকির মাঝখানে আবার অবস্থিত ছিল দহল খাগড়াবাড়ি নামে একটি অতি ক্ষুদ্র ভারতীয় ছিট।[৪২]

তাই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার ছিটমহল বিনিময়ের কাজ ২০১৫ সালে প্রায় ৯৯% সমাপ্ত হলেও এর উৎপত্তির ইতিহাস আজও রহসাবৃত। ছিটমহল সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপরোক্ত তৃতীয় বিশ্লেষণটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও ঐতিহাসিক হলেও এ বিশ্লেষণ ছিটের মধ্যেকার ছিট সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব। একটা কথা সমাজে খুব প্রচলিত আছে যে, যা রটে, তার কিছুটাও বটে। তাই সকল দিক বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সাবেক ছিটমহলগুলির উৎপত্তির ক্ষেত্রে কম বেশি উপরের তিনটি সূত্রের ভূমিকাই কার্যকারী ছিল।

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিবরণী

উৎপত্তির ইতিহাস যাই হোক না কেন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০১৫ সালে বা তারও পূর্বে বিনিময়যোগ্য ছিটের সংখ্যা ছিল, ১৬২টি। এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিট ছিল ১১১টি এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিট ছিল ৫১টি।[৪৩] (নিম্নে একটি নকশা দ্বারা ছিট সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হল।)

নকশা নং ১:[৪৪]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সাবেক ভারতীয় ছিটমহলগুলির বিভিন্ন তথ্য			
বাংলাদেশের যে জেলায় অবস্থিত ছিল	ছিটমহলের সংখ্যা	মোট জমির পরিমাণ (একর)	মোট জন- সংখ্যা (জন)
লালমনির হাট	৫৯	১৭১৫০.০৫	৩৭,৩৬৯
নীলফামারী	০৪		
কুড়িগ্রাম	১২		
পঞ্চগড়	৩৬		
মোট	১১১		

নকশা নং ২:[৪৫]

ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশি সাবেক ছিটমহলগুলির বিভিন্ন তথ্য			
কোচবিহারের যে থানায় অবস্থিত ছিল	ছিটমহলের সংখ্যা	মোট জমির পরিমান (একর)	মোট জনসংখ্যা (জন)
কুচলিবাড়ি	০৯	৭১১০.০২	১৪,২২১
মেখলিগঞ্জ	০২		
মাথাভাঙ্গা	১২		
শীতলকুচি	০৬		
দিনহাটা	১৯		
তুফানগঞ্জ	০৩		
মোট	৫১		

ছিটমহলগুলির সৃষ্টি ষোড়শ এবং শপ্তদশ শতাব্দীতে হলেও এগুলি সমস্যাবহুল হয়ে উঠে ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার নামে দেশ ভাগ হলে বঙ্গের বৃহৎ অংশ তথা পূর্ব ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। সমগ্র রংপুর ও দিনাজপুর সদরসহ দিনাজপুর জেলার বৃহৎ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে পরিণত হয়। সঙ্গত কারণে দিনাজপুর ও রংপুরে অবস্থিত ছিটমহলগুলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহলে পরিণত হয়। অপরদিকে রংপুর জেলার খতিয়ানভুক্ত কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত বঙ্গীয় ছিটমহলগুলি পাকিস্তানি ছিটমহলে পরিণত হয়। সময় যতই গড়িয়েছে, সমস্যা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৯ সালে কোচবিহার রাজ্য ভারত সরকারের "Instrument of Accession" এ স্বাক্ষর করে ভারতের সঙ্গে যোগ দেয় এবং ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।[৪৬] এ সময় ছিটমহল সমস্যা পাক-কোচ সমস্যার পরিবর্তে ইন্দো-পাক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইতিহাসও পরিবর্তিত হয়; স্বাধিনতাকামী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হলে ছিটইমহল সমস্যাও নতুন ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয়। এ সময় থেকে ইন্দো-পাক ছিটমহল সমস্যা ইন্দো-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যায় পরিণত হয়।

দাসিয়ারছড়া ছিটমহল বিবরণী

উপরের এক নং নকশায় উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদশের অভ্যন্তরে মোট বিনিময়যোগ্য ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যা ছিল ৫১টি; এর মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত ছিটমহলের সংখ্যা ছিল ১২টি। এ ১২টি ছিটমহলের মধ্যে অন্যতম ছিল এ দাসিয়ারছড়া নামক ছিটমহল। ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়া ছিল মূলত কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার অংশ এবং বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার অভ্যন্তরে অবস্থিত। লালমণিরহাট ও কুড়িগ্রাম শহরের মাঝামাঝি ধর্লা নদীর উত্তর-পূর্ব তীরে অবস্থিত এ ছিটমহলটির আয়তন ছিল ১৬৪৩.৪৪ একর; এবং লোকসংখ্যা ছিল; ৯৫১০ জন (বিনিময়ের পূর্বের হিসেব অনুয়ায়ি)। মোট ৯৫১০ জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ছিল, ৪৯৪১ জন এবং মহিলা ছিল ৪৫৫৯ জন।[৪৭] এ ছিটমহলটির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এখানে অন্যান্য ভারতীয় ছিটমহলের তুলনায় হিন্দু জনসংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মত। মোট হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৬৪০ জন;[৪৮] শতকরা হিসেবে ৬.৭২%; যদিও বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হিসেব এর অনেক বেশী। তবুও বলা যায় যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলির মধ্যে এ দাসিয়ারছড়া ছিটমহলটিতে অন্যান্য ছিটমহলের তুলনায় হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হিসেব ছিল অনেক উর্দ্ধে। এ ছাড়াও লোক সংখ্যা, আয়তন ও অন্যান্য বেশ কিছু কারণে এ ছিটমহলটি গবেষক ও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

নকশা নং-৩[৪৯]

(কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত ছিটমহলগুলির নাম)

ক্রম	ছিটমহলগুলির	আয়তন(একর)
১.	দাসিয়ারছড়া	১৬৪৩.৪৪
২.	ডাকুরহাট-ডাকিনীর কুঠি	১৪.২৭
৩.	কালমাটি	২১.২১
৪.	সাহেবগঞ্জ	৩১.৫৮
৫.	সেউতি কুর্শা	৪৫.৬৩
৬.	বড়ো গাও চুলকা	৩৯.৯৯
৭.	১নং গাও চুলকা	৮.৯২
৮.	২নং গাও চুলকা	০.৯০
৯.	১নং দিঘলটারী	১২.৩১
১০.	২নং দিঘলটারী	৮.৮১
১১.	১নং ছোট গারল ঝোরা	৩৫.৭৪
১২.	২নং গারল ঝোরা	১৭.৮৫

তবে ২০১৫ সালে বিনিময়ের পূর্বে অন্যান্য ছিটমহলবাসীর ন্যায় দাসিয়ারছড়া ছিটমহলবাসীর জীবন ও জীবিকা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কৃষি, মৎস্য চাষ ও মৎস আহরণ এবং পশুপালনই ছিল তাদের মূল পেশা। কৃষির মান ছিল খুবই নিম্ন; কৃষিতে সেচ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। অধিকাংশ ছিটমহলের ন্যায় দাসিয়ারছড়া ছিটমহলটির রাস্তা ঘাট ছিল মধ্যযুগীয় ধাঁচের এবং যান চলাচলের প্রায় অযোগ্য।[৫০] ভারতে বাংলাদেশি ছিটমহলগুলির অবস্থা ছিল কিছুটা ভাল। কারণ তারা অনায়াসেই ভারতীয় খোলা বাজার থেকে রাসায়নিক সার ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক সংগ্রহ করতে সমর্থ হতো, সে ক্ষেত্রে অর্থ ছাড়া অন্য কোন বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন তাদের হতে হত না। বাজার দরেরও কোন হের ফের হত না, অর্থাৎ একজন ভারতীয় মুল

ভূখণ্ডের কৃষক খোলা বাজার থেকে যে মূল্যে সার ক্রয় করত, একজন ছিটমহলের বাসিন্দাও একই মূল্যে খোলা বাজার থেকে সার ও ঔষধ সংগ্রহ করতে পারত।[৫১] অপর দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলের কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই সঙ্গীন। কারণ, বাংলাদেশে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার খোলা বাজারে পাওয়া যেত না। এর জন্য কৃষক কার্ড সংগ্রহ করতে হত এবং ডিলারে স্মরণাপন্ন হতে হত। খোলা মার্কেটে সার ও কৃষির প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র পাওয়া না যাওয়ায় এবং ছিটমহলের কৃষকদের কৃষি কার্ড করার অধিকার না থাকায় তারা উন্নত কৃষি কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হতেন। তারা কতিপয় ক্ষেত্রে মূল ভূখণ্ডের কৃষকদের নিকট থেকে দ্বিগুণ মূল্যে সার ও ঔষধ সংগ্রহ করত। ফলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মূল ভূখণ্ডের কৃষকদের তুলনায় অনেকাংশে খারাপ ছিল। তবে দাসিয়ারছড়ার ক্ষেত্রে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। এখানকার জমি ছিল উর্ব্বর এবং জনগণ ছিল খুবই ঐক্যবদ্ধ এবং উৎসাহী। এ ছাড়াও এখানে গণপ্রজাতন্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছিল একটি পরিষদ। যে পরিষদটি সদাসর্বদা জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিল।[৫২]

কৃষি ছাড়াও দাসিয়ারছড়া ছিটমহলের বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল মৎস্য চাষ ও পশু পালন। মরা নদী, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতিতে তারা মৎস্য চাষ করত। ছিটমহলের ভূখণ্ড ছাড়াও মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন নদী-নালা খাল-বিল, জলাশয় থেকেও মৎস্য আহরণ করে অনেকেই জীবন ধারণ করত। মৎস্য চাষ ও মৎস্য আহরণ ছাড়াও পশুপালনের মাধ্যমেও দাসিয়ারছড়া ছিটমহলের বাসিন্দাগণ আর্থিক প্রগতি সাধনের প্রায়াস চালাত। তবে এ পশু পালন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ছিল না। গৃহ পালিত পশু হিসেবেই পশু পালন প্রচলিত ছিল। বাণিজ্যিকভাবে বন সৃজন প্রকল্প না থাকলেও এ ছিটমহলের বাসিন্দাগণ বাড়ির আনাচে কানাচে বৃক্ষ রোপন করে তা পরবর্তীতে বিক্রি করেও আর্থিক ভাবে সচ্ছলতা অর্জনের চেষ্টা চালাত। তবে এ বৃক্ষ চাষ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফল জাতীয় বৃক্ষ। বিশেষ অভাব বা আর্থিক প্রয়োজন মেটাতেই ঐ ধরণের বৃক্ষ ছেদন করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বনজ বৃক্ষের চাষও লক্ষ্য করা গেছে।[৫৩]

চারিদিকে বাংলাদেশী ভূ-খন্ড বেষ্টিত দাসিয়ারছড়া'র আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে ঘরে ঘরে গাঁজা গাছের চাষ হতো। যেহেতু এটি ভারতীয় অংশ ছিল, তাই বাংলাদেশী আইনে গাঁজা চাষ নিষেধ হলেও এখানে বাংলাদেশী আইন চলতো না। জীবিকার তাগিদে তারা হয়তো এ গাঁজা চাষের দিকে ধাবিত হয়েছেন।

অনেকেই হাতের কাজকে সম্বল করে জীবিকা নির্বাহ করত। কাঠ মিস্ত্রি, বা সুতোর, রাজমিস্ত্রি, রঙ মিস্ত্রী, বাঁশের কাজের মিস্ত্রি, কুমোরের কাজ ইত্যাদি দ্বারাও অনেকেই জীবন ও জীবিকা পরিচালিত করতেন। অনেকেই আবার মূল ভূখণ্ডের শহর ও নগরীতে রিক্সা চালিয়ে ও কল কারখানায় কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে মরিয়া প্রায়াস চালিয়েছেন। সরকারী চাকুরী কোন অঞ্চলের মানুষের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। সরকারী সহযোগিতার অভাবে সাবেক ছিটমহলগুলিতে কোন প্রকার শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠেনি। ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটমহলগুলির অনেকেই মূল ভূখণ্ডে জমি ক্রয় করে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করত এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষাও অর্জন করত; উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী চাকুরী অর্জন করতে সমর্থ হত। তবে এ হার ছিল হাজারে একজন; তাই অর্থনীতিতে এর প্রভাব ছিল খুবই গৌণ।[৫৪] ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটমহলের বাসিন্দারা তবুও অনায়াসেই ভারতীয় ভূখণ্ডে জমি ক্রয় করে বাড়িঘর করতে পারত, শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করার সুযোগ পেত, অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে সকল

প্রকার সুযোগ সুবিধার অধিকারী হত। অপর দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সাবেক ভারতীয় ছিটমহলগুলির অবস্থা ছিল খুবই করুণ। ওখানে ছিটমহলের বাসিন্দা মূল ভূখণ্ডে জমি ক্রয় করার অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া মূল ভূখণ্ডের নাগরিকরাও ছিটমহল বাসীদের নিকট জমি বিক্রয় করতে রাজি ছিলেন না। তাই বাংলাদেশি ছিটমহলগুলির তুলনায়, ভারতীয় ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদের অবস্থা ছিল আরও করুন। যেহেতু এরা বাংলাদেশি মূল ভূখণ্ডে জমি ক্রয় করতে পারত না, সেহেতু এদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এদের ছেলেমেয়েদের মূল ভুখণ্ডের বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মূল ভূখণ্ডের কোন আত্মীয় বা স্বজনের মধ্যে কাউকে নকল পিতা সাজিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে হত। তার পর যদি অনুসন্ধানে তা ধরা পড়ত, তাহলে মূল পিতা ও নকল পিতা উভয়রই চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হত।[৫৫]

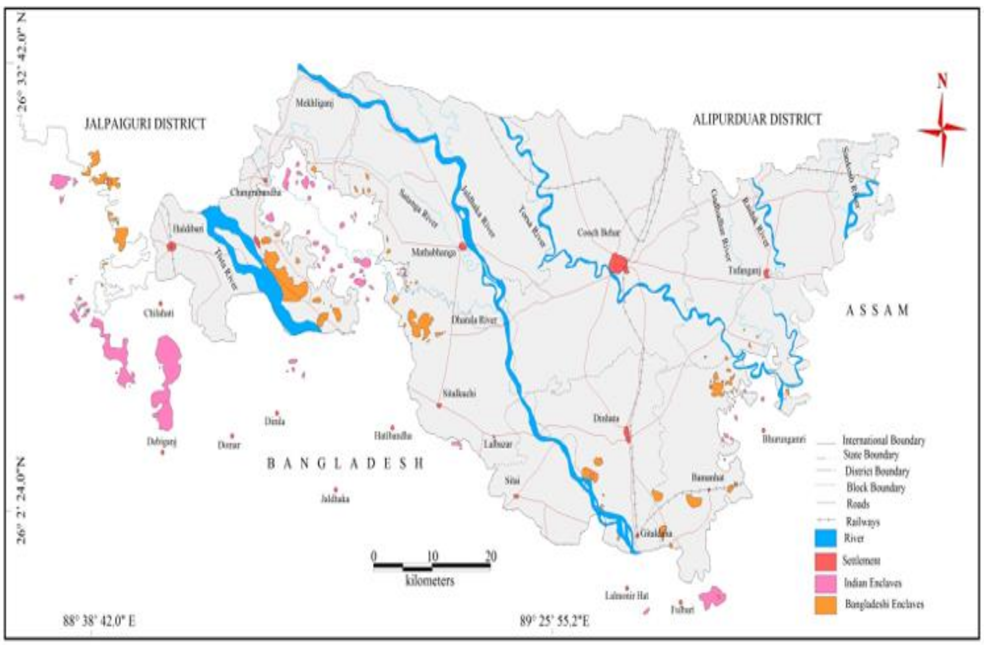

চিত্র-১: ভারত- বাংলাদেশের মানচিত্রে ছিটমহলসমূহ [৫৬]

এ প্রসঙ্গে দাসিয়ারছড়া ছিটমহলের একটি উদাহরণ প্রণিধানযগ্য। একবার ২০১৩ সালে এ দাসিয়ারছড়া ছিটমহল পরিভ্রমণে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম এক ভদ্রলোকের (ভয়ে নাম উল্লেখ করতে নারাজ) দুই পুত্র মূল ভূখণ্ড থেকে শিক্ষা লাভ করে কোনক্রমে চাকুরী পেয়েছিল বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে। পরে আশু অনুসন্ধানে সেনা কর্তৃপক্ষ জানতে পারে ঐ দুই সেনা সদস্য বাংলাদেশি নাগরিক নয়; তাদের ভাগ্যে চরম শাস্তি নেমে আসা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। একজন সুহৃদ সেনা কর্মকর্তার সহায়তায় তারা সেদিন কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন। তবে চাকুরী হাতে পেয়েও তা হারাতে হয়েছিল; এ বেদনা তারা সহ্য করে উঠতে পারেনি। এ দু'সহদর আজো অর্ধ পাগল অবস্থায় দাসিয়ারছড়াতেই বসবাস করছে মর্মে স্থানীয়রা জানিয়েছে। হাজার ঘটনার ও বেদনার মধ্যে এগুলি দু-একটি উদাহরণ মাত্র।[৫৭] অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেও দাসিয়ারছড়া

ছিটমহলবাসী নানা কারণে গবেষক ও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল; একটি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে বাস করেও তারা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো নির্মানের প্রয়াস চালিয়েছিল।

এ দাসিয়ারছড়া ছিটমহলটির মাঝখানে অবস্থিত ছিল একটি জাঁকজমক পুর্ণ বাজার, এ বাজারটির নাম কালির হাট; এখানে একটি মন্দিরও অবস্থিত ছিল। এ কালিরহাট ছিল 'দাসিয়ারছড়া' ছিটমহলটির সদর দপ্তর। কালির হাটকে রাজধানী করে এখানে গড়ে উঠেছিল একটি ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক প্রয়াস; যদিও এ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় অনুপস্থিত ছিল আধুনিক গণতন্ত্রের সিংহভাগ বৈশিষ্ট। তবুও সীমিত সাধ্যের মধ্য দিয়ে তারা যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছিল, তাকে অবশ্যই অভিবাদন জানাতেই হয়। ভোটদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নয়; বয়োজ্যেষ্ঠ ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের অনুষ্ঠিত সভায় তিন বছরের জন্য মনোনীত হত ১০ জন মেম্বার (সদস্য)। এ দশ জনের মধ্য থেকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মেম্বারকে সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) মনোনীত করা হত। দক্ষ ও যোগ্য এবং মোটামুটি শিক্ষিত দেখে একজনকে মনোনীত করা হত সম্পাদক (প্রধান মন্ত্রী)। অপর ৮ জন সদস্যকে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পন করা হত। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকত এ প্রশাসনিক বোর্ডে।[৫৮]

চিত্র-২: ১৯৯৪ সালে 'দাসিয়ারছড়া' জনগনের ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত একটি ব্যানার

দাসিয়ারছড়া'র এ নির্বাচিত ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কর্মের অন্তর্ভূক্ত ছিল রাস্তাঘাট মেরামত, শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়তা, জমি ক্রয়-বিক্রয় সমস্যা সমাধান করা, বিভিন্ন রকমের বিরোধের মীমাংসা করার জন্য বিচারিক আদালত পরিচালনা করা ইত্যাদি। ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক সরকারের মূল চালিকা শক্তি হল অর্থ। ছিটমহলটির গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থের উৎস ছিল এ বৃহৎ ছিটমহলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নীলকমল নদী [৫৯] থেকে প্রাপ্ত আয়। হিসেব মতে এ নদী থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা আয় হত।[৬০] এ নদীতে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষ করা হত মৎস্য। এ নদী থেকে আসা অর্থই ছিল দাসিয়ারছড়া'র গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কর্ম পরিচালনার প্রধান উৎস। বাজেট অধিবেশন এ সরকারের দশজন সদস্য ছাড়াও উপস্থিত থাকতেন উক্ত ছিটমহলের মান্যগন্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা।[৬১] এ ভাবে ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে দাসিয়ারছড়াবাসী কষ্টের মধ্যেও শান্তির অনুসন্ধান চালিয়েছিল।

শুধু দাসিয়ারছড়া নয়, ২০১৫ সালে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের পূর্বে ১৯৪৭ সালে থেকে ২০১৫ সালে পর্যন্ত সময়কালে ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত অধিকাংশ ছিটমহলের হাজার হাজার মানুষ ছিল সভ্য জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, এরা ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে ব্রাত্য বলেই পরিগণিত হয়েছিল। তবে এদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য চেষ্টা যে চলেনি, এ কথাও বলা যায় না। তবে সেটি ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কূটনীতির পঙ্কিল বেড়াজালে আবদ্ধ। ১৯৪৭ পরবর্তী জামানায় 'নেহেরু-নুন' (১৯৫৮ সালে), 'ইন্দিরা-মুজিব' (১৯৭৪সালে), 'ইন্দিরা-এরশাদ' (১৯৮২ সালে) 'হাসিনা-মনমোহন' (২০১১ সালে) চুক্তিগুলির সফল রূপায়নের মধ্য দিয়ে ছিটমহলবাসীদের ভাগ্য পরিবর্তনে সময় লেগেছিল প্রায় ৬৮ বছর। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমোহন সিংহ আলোচনার মধ্য দিয়ে দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ এবং ছিটমহল বিনিময় বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছাতে সমর্থ হন।[৬২] অবশেষে ভারতের সংসদে ১১৯ তম সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয় এবং ২০১৫ সালের ৭ই মে তারিখের অধিবেশনে বিলটি গৃহীত হয় এবং ১০০তম সংবিধান সংশোধনী আইনে পরিণত হয়। এ আইনের মাধ্যমে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ২০১৫ সালের ১লা অগষ্ট রাত ১২:০১ মিনিটে উভয় দেশের মাঝে ছিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়াটি আইনগতভাবে সম্পন্ন হয়।[৬৩]

ছিটমহল বিনিময়ে দাসিয়ারছড়ার ঘটনাবলী

ছিটমহল বিনিময়ের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত মোট বিনিময়যোগ্য ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলের হিন্দু-মুসলমান মিলে মোট বাসিন্দা ছিল, ৩৭৩৩৪ জন। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে মাত্র ৯৮০ জন ছিটমহলবাসী ছিটমহলের আদি বাড়ি ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে শুধু দাসিয়ারছড়া এবং বালাপাড়া খাগরিছড়িতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল (৬৪০+৫৬৫)=১২০৫ জন।[৬৪] এছাড়াও দাসিয়ারছড়া ছিটমহল থেকে মোট ৫৮টি পরিবার দাসিয়ারছড়া ত্যাগ করে ভারতে চলে এসেছিলেন; এ ৫৮টি পরিবারের মধ্যে যেখানে ৩২টি পরিবারই মুসলিম এবং মাত্র ২৬টি পরিবার হিন্দু। তাই দেখা যাচ্ছে যে, সরকারীভাবে মুসলিম প্রধান দেশ থেকে হিন্দু প্রধান দেশে পুনর্বাসনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও অসংখ্য হিন্দু পরিবার দাসিয়ারছড়াতেই থেকে গেলেন, অর্থাৎ বাংলাদেশী নাগরিকত্ব গ্রহন করলেন। অপর দিকে দাসিয়ারছড়া থেকে যারা ভারতে এলেন, তাঁদের সিংহ ভাগই মুসলিম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে হিন্দু উদবাস্তুদের আগমনের ক্ষেত্রে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নির্যাতনের বহুল প্রচারিত তত্ত্বটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

পানি যেমনি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উচ্চতরও অবস্থান থেকে নিম্নতরও অবস্থানের দিকে ধাবিত হয়। অনুরূপভাবে মানুষও সুযোগ পেলে নিম্নমূখী অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে উর্দ্ধমূখী অর্থনৈতিক অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে দলে দলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিল। এর মূলে শুধু মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নির্যাতনের ব্যাপারটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর পেছনে যে কারণগুলি ক্রিয়াশীল ছিল, তা হল:

(১) দুর্বল অর্থনীতি সম্পন্ন দেশ থেকে তুলনামুলক সবল অর্থনীতি সম্পন্ন দেশে যাত্রা করা;

(২) ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের দেশ থেকে বৃহৎ ভূখণ্ডের দেশে গমন করা;

(৩) সংখ্যালঘু তকমা মুছে সখ্যাগরিষ্ঠ তকমা অর্জন করা। এবং

(৪) পরিস্থিতিগত কারণে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

১৯৪৭ পরবর্তী জামানায় অসংখ্য ভাটিয়া (ভাটি দেশ থেকে আসা) মুসলমান, যারা নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সীমান্তবর্তী ভারতীয় ভূখণ্ডে আস্তানা গেড়েছিলেন। কোচবিহারের কালমাটি, চাউলের কুটি, প্রভৃতি অঞ্চলে এদের বসবাস লক্ষ্যনীয়।[৬৫] এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলা এবং অসমের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলায় এদের আগমন ঘটেছিল। ১৯১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলির অসংখ্য হিন্দু বাসিন্দা সরকারীভাবে ভারতে আসার সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করেনি। এর পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল ১৯৪৭ এর পূর্ব পাকিস্তান বা ১৯৭১ এর বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনায় ২০১৫ সালের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছিল অনেক উর্দ্ধগামী এবং আকাশ-পাতাল তফাৎ।[৬৬] আবার যারা ছিটমহল ত্যাগ করে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিল, তাদের একটা বিরাট অংশ মুসলমান। মূলত: অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সরকারী সাহায্যের আশায় এরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পাড়ি জমিয়েছিল। তবে ছিটমহল বিনিময়ের সময় স্বদেশ ভূমি ভারতে যারা পাড়ি জমিয়েছেন, তারা খুব ভালো নেই। বিশেষ করে মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠি নানা সংকট মোকাবেলা করছেন। মো. কাজিম উদ্দিন নামের এক কৃষকের মতে, তার দুই ভাই এবং দুই বোন বিনিময়ের সময় লোভে পড়ে ভারতে চলে গেছেন। তিনি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বাংলাদেশে থেকে গেছেন। এখন ভারতে যাওয়া বোন-ভাইয়েরা পাসপোর্ট নিয়ে এসে কান্নাকাটি করেন। তারা সেখানে খুব কষ্টে আছেন জানান। তারা আবার দাসিয়ারছড়ায় ফিরে আসতে চান।[৬৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছিটমহল বিনিময়ের সময় ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিনিময়যোগ্য বাংলাদেশি ৫১টি ছিটমহলের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪২২১ জন; যাদের একজন বাসিন্দাও ছিটমহলের আদি বাড়ি ত্যাগ করে বাংলাদেশে গমন করতে রাজি হয়নি।[৬৮] যদিও এ ১৪২২১ জন বাসিন্দার মধ্যে ৯০% যাদের অধিক মানুষ ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী। এর পেছনেও একই কারণ, এরা ভারতের মত শক্তিশালী আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের মত অপেক্ষাকৃত দূর্বল অর্থনীতির দেশে যেতে নারাজ ছিল। অপরদিকে যে, ৯৮০ জন মানুষ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল থেকে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিল তাদের একটা বিরাট অংশই এসেছিলেন দাসিয়ারছড়া থেকে। হয়তো বা সেই কারণেই ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ সরকার সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য যে উন্নয়নের কর্মকান্ডের সুত্রপাত করেছিলেন, তার অন্যতম অভিযান শুরু করেছিল এ দাসিয়ারছড়া থেকেই।[৬৯]

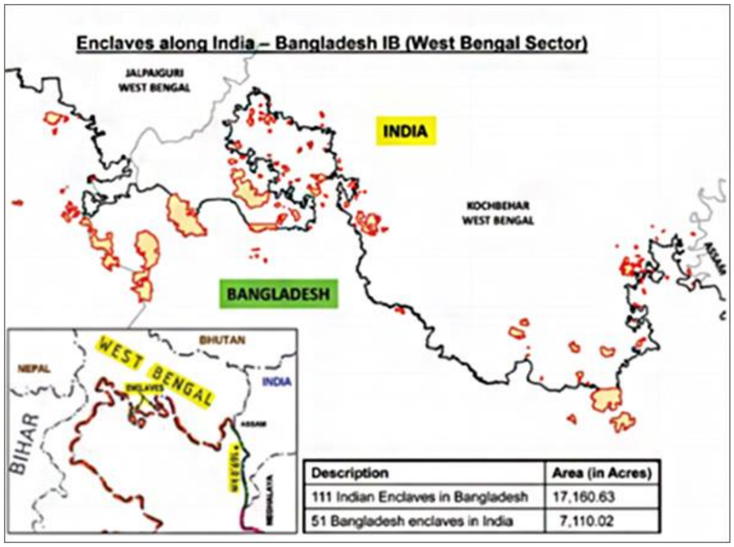

চিত্র-৩: মানচিত্রে আসাম, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সীমান্তবর্তী এলকায় অবস্থিত একনজরে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলসমূহ [৭০]

ছিটমহল বিনিময়ের অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সরকার দাসিয়ারছড়া এলাকায়, পাকা রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ঋণ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন প্রভৃতি দ্বারা এলাকাটিকে উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দাসিয়ারছড়া। বিনিময়ের পর সাবেক এ ছিটমহলটির নতুন নামকরণ করা হয় 'মুজিব-ইন্দিরা দাসিয়ারছড়া ইউনিয়ন' হিসেবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালের ১৬ মে, বাংলাদেশ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী 'মুজিব-ইন্দিরা' স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি দীর্ঘ সময় ধরে নানা কারণে বাস্তবায়ন হতে পারনি, তবে ২০০৯ সালের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে সরকারের কুটনৈতিক প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই রাতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময় সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এর ফলে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল যুক্ত হয় এবং ভারতের অভ্যন্তরে ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল তাদের মূল ভূখন্ডে সংযুক্ত করা হয়।

উপসংহার

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ছিটমহল বিনিময়কে বিশ্বের অন্যতম জটিল সীমান্ত সমস্যার সমাধানের একটি ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত কার যায়। ভারত-বাংলাদেশ ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট (LBA)[৭১]-এর মাধ্যমে উভয় দেশ সফলভাবে ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন করেছে। যার ফলে একে অপরের ভূখণ্ডজুড়ে বসবাসকারী প্রাায় অসংখ্য মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্টের প্রেক্ষিতে ছিটমহল বিনিময় কর্মটির মাধ্যমে মূলতঃ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির পর থেকে অব্যাহত আঞ্চলিক বিরোধের একটি সুচারু সমাধান সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে আলোচ্য 'দাসিয়ারছড়া'সহ সংশ্লিষ্ট ছিটমহলবাসীদের দীর্ঘ দিনের সম্মুখীন হওয়া কষ্টের সমাধানের প্রস্তাব দেয়া হয়, যা কয়েক দশক ধরে আইনি ও প্রশাসনিক অস্থিরতার মধ্যে বসবাসকারী

জনগণের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এ বিনিময়টি উভয় দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে উন্নত কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এর মাধ্যমে মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার, নাগরিকত্বের সমাধান এবং উন্নত জীবনযাত্রার দিক নির্দেশনা খুঁজে পাবে। অধিকন্তু, এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বর্ধিত বাণিজ্য, নিরাপত্তা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের দরজা খুলে দিয়েছে। এ চুক্তির সাফল্য আপাতদৃষ্টিতে অদম্য চ্যালেঞ্জের সমাধানে কূটনৈতিক আলোচনার পথ দেখিয়েছে। এমনকি সবচেয়ে জটিল আঞ্চলিক বিরোধের মধ্যেও সহযোগিতা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা এরুপ বিরোধপূর্ণ অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

তথ্য সূত্রঃ

১ আহমদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *কোচবিহারের ইতিহাস*, কোচবিহার, ১৯৩৬, পুনমুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ.২৬৭-২৭৮

২ *পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার*, কোচবিহার, ১৯৭৭, পৃ. ৪৬

৩ চক্রবর্ত্তী রঞ্জন, ছিটমহলঃ ব্রাত্যজনের উপাখ্যান (প্রবন্ধ), মূল গ্রন্থ, *বেরুবাড়ি তিনবিঘা ছিটমহল* (সম্পাদনা), রাজর্ষি বিশ্বাস, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৩০

৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৩

৫ লতিফ হোসেন, *ছিটমহলের বৃত্তান্তঃ ইতিহাসে ও আখ্যানে*, https://abhikhhep.com/2024/02/29/chitmahaler_britanto/

৬ মিত্র অমর, 'এখন যা লিখছি', সাহা, সুশীল (সম্পাদিত), *ধারাভাষ্য*, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, *কলকাতা*, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১৫

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩২

৮ *প্রাগুক্ত*

৯ *প্রাগুক্ত*

১০ *প্রাগুক্ত*

১১ *প্রাগুক্ত*

১২ *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৫

১৩ চক্রবর্ত্তী রঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩০

১৪ পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬

১৫ করিম আবদুল, *বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল)*, ঢাকা, ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১১,পৃ.১৮৭-১৮৯

১৬ আহমদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৭

১৭ *প্রাগুক্ত*

১৮ রায় অনিরুদ্ধ, *মুঘোল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.৭১৮

১৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭২৬

২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৩৩

২১ *প্রাগুক্ত*

২২ আহমেদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭২

২৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৭

২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬-২৭০

২৫ মজুমদার আর. সি, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৪৬৮ এবং F.G, Glazier: District of Rangpur, p.13

২৬ আহমেদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭২

২৭ নাগ হিতেন, *কামতাপুর থেকে কোচবিহার*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৫২

[২৮] Chowdhury H.N, *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement*, Cooch Behar State Press, 1903 and New edition, edited by Dr. Pal, N.N; Siliguri, 2010, p. 251 এবং আহমদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

[২৯] নাগ হিতেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫২

[৩০] চাকী দেবব্রত, *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত*, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৫ এবং আহমদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

[৩২] হুসাইন আমজাদ, *কামরূপ থেকে কোচবিহার*, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৮৬

[৩৩] আহমদ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩-১৮৪

[৩৫] *প্রাগুক্ত*

[৩৬] *প্রাগুক্ত*

[৩৭] চাকী দেবব্রত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

[৩৮] হুসাইন আমজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭; চাকী দেবব্রত, *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত*, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৬ - ৪০

[৩৯] চক্রবর্তী রঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

[৪০] *প্রাগুক্ত*

[৪১] *প্রাগুক্ত*

[৪২] *প্রাগুক্ত*

[৪৩] *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই, ২০১৫ থেকে ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর তিনটি সংখ্যা থেকে।

[৪৪] Whyte, Brendan R; "Waiting for the Esquimo: An Historical and Documentory Study of the Coochbehar Enclaves of India and Bangladesh"; School of Anthropology and Geography, *Geography and Environmental Studies*; The University of Melborn, 2002, pp. 437-39; কিরণ গোলাম মোস্তফা, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা, ২০০১, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ৯৯-১০০

[৪৫] Whyte, Brendan R, *Ibid*, pp. 437-39

[৪৬] *কোচবিহার জেলার চিত্র*, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, জুলাই ২০০৬, পৃ. ২৫

[৪৭] হুসাইন আমজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

[৪৯] Barman, R.K: *The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh: A Historical Social Study*, New Delhi, 2019, pp. 227-231 এবং কিরণ, গোলাম মোস্তফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

[৫০] গবেষকদের একাধিকবার দাসিয়ার ছড়া পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন- মোঃ মুজফফর আলী, বয়স- ৫৫, পেশা- কৃষি, ঠিকানা- দাসিয়ার ছড়া, সাবেক ভারতীয় ছিটমহল, কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ। সাক্ষাৎকারের তারিখ- ১৫/১০/২০১১ ইং

[৫১] বাংলদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের একাধিক সাবেক ছিটমহলে গবেষকগণ অসংখ্যবার ভ্রমণ করেছেন; এ ছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ সরকার, জনাব আলী; বয়সঃ ৭৫; পেশাঃ কৃষি; ঠিকানাঃ বাত্রিগাছ (পূর্বতন বাংলাদেশি ছিটমহল); দিনহাটা; কোচবিহার। সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৬/০২/২০২২ ইং

[৫২] গবেষকদের দাসিয়ার ছড়া ভ্রমণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ পরিষদের সদস্য যিনি মাষ্টার দা নামেই সর্বাধিক পরিচিত; বয়সঃ ৫৬; পেশাঃ ছিটমহলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, ঠিকানাঃ পূর্বতন ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ার ছড়া; তারিখঃ ১৫/১০/২০১১ ইং

[৫৩] *প্রাগুক্ত;* সাক্ষাতকার থেকে

[৫৪] গবেষকদের ভারতীয় এবং বাংলাদেশী একাধিক ছিটমহল পরিদর্শন দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ সরকার, জনাব আলি; বয়সঃ ৭৫; পেশাঃ কৃষি; ঠিকানাঃ পূর্বতন বাংলাদেশী ছিটমহল বাত্রিগাছ; তারিখঃ ১৫/১০/২০১৩ ইং

৫৫ ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ মোঃ মিজানুর রহমান; (ছিটমহল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্ব); বয়সঃ ৫০; পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি; ঠিকানাঃ ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম; বাংলাদেশ; সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৬/১০/২০১১ ইং

৫৬ Whyte, Brendan R., *Ibid*

৫৭ হুসাইন, আমজাদ; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪

৫৮ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, মোঃ মুজফফর আলী ; বয়সঃ ৫৫; পেশাঃ কৃষি ; ঠিকানাঃ দাসিয়ার ছড়া; সাবেক ভারতীয় ছিটমহল, কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ। সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৫/১০/২০১১ ইং

৫৯ এ নদীটি স্থানীয়ভাবে মরা নদী নামেও পরিচিত ছিল। জুলাই ২০২৪-এ বাংলাদেশ সরকার এ নদীটি খননের কার্যকম শুরু করেছে, https://www.news24bd.tv/details/17055

৬০ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ (১) মোঃ মিজানুর রহমান; (ছিটমহল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্ব); বয়স- ৫০; পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি; ঠিকানাঃ ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম; বাংলাদেশ; সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৬/১০/২০১১ ইং; (২) মোঃ মুজফফর আলী; বয়সঃ ৫৫; পেশাঃ কৃষি ; ঠিকানাঃ দাসিয়ার ছড়া; সাবেক ভারতীয় ছিটমহল, কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ। সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৫/১০/২০১১ ইং;

৬১ ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ (১) রমনী বর্মণ; বয়স ৫০; পেশাঃ কৃষি; ঠিকানাঃ দাসিয়ার ছড়া; সাবেক ভারতীয় ছিটমহল, কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ। সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৫/১০/২০১১ ইং; (২) জয়নাল আবেদিন;বয়স ৫৫; পেশাঃ কৃষি; ঠিকানাঃ দাসিয়ার ছড়া; সাবেক ভারতীয় ছিটমহল, কুড়িগ্রাম বাংলাদেশ। সাক্ষাৎকারের তারিখঃ ১৫/১০/২০১১ ইং

৬২ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে। বিশেষ করে *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে।

৬৩ *উত্তরবঙ্গ সংবাদ;* ১লা অগষ্ট, ২০১৫ ইং; শিলিগুড়ি সংখ্যা

৬৪ গবেষকদ্বয় কর্তৃক দাসিয়ার ছড়া ছিটমহল থেকে ভারতে আসা ৫৮টি পরিবারের জন্য গড়ে তোলা টাউনশিপ (দিনহাটা ১ নং ভিলেজ, কোয়ালিদহ অঞ্চল) পরিদর্শন ও সাক্ষাতকার গ্রহণঃ সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ (১) খলিলুর রহমান; বয়সঃ ৭৪; পেশাঃ ব্যবসা; ঠিকানাঃ কোয়ালিদহ টাউনশিপ (যা, দাসিয়ার ছড়া থেকে ভারতে আগত বাসিন্দাদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।); দিনহাটা; কোচবিহার। (২) মোঃ কাশেম আলী মিয়াঁ; বয়সঃ ৬৫; পেশাঃ শ্রমিক; ঠিকানাঃ কোয়ালিদহ টাউনশি (যা, দাসিয়ার ছড়া থেকে ভারতে আগত বাসিন্দাদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।); দিনহাটা; কোচবিহার। তারিখঃ ২০/০২/২০২৪ ইং;

৬৫ গবেষকগণ কর্তৃক ক্ষেত্র সমীক্ষা দ্বারা তথ্য সংগ্রহ; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ (১) মিয়া, মন্সুর, বয়সঃ ৬০; পেশাঃ কৃষি; ঠিকানাঃ কালমাটিঃ দিনহাটা; কোচবিহার; তারিখঃ ১৫/০৮/২০১২ ইং; এবং (২) রহমান, মতিউরঃ বয়সঃ ৫৫; পেশাঃ ব্যবসা; ঠিকানাঃ চাউলের কুঠি; তুফাঙ্গঞ্জ; কোচবিহার

৬৬ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক প্রগতির হার ছিল খুবই মন্থর। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যেও তেমন ভাবে আর্থিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯৮১ পরবর্তী বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আর্থিক অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হয়। যেখানে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাথা পিছু জি ডি পি ছিল, ১০০০ মার্কিন ডলারের নীচে। সেখানে ২০১৫ সালে মাথা পিছু জি ডি পির পরিমান দাড়ায় মার্কিন ডলার ২০০০ এর অনেক উপরে। (সূত্রঃ গোলাম মোস্তফা কিরণ কর্তৃক সম্পাদিত, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা, ২০১১ এবং মনোরমা ইয়ার বুক, ২০১৪-২০২০, পৃ ৫)

৬৭ *দৈনিক বান্দরবান*, ২২ এপ্রিল ২০২১, https://www.dainikbandarban.com/development/14910

৬৮ *উত্তরবঙ্গ সংবাদ;* শিলিগুড়ি সংস্করণ, ২৭ 'জুলাই থেকে ২' অগষ্ট, ২০১৫' এর সংখ্যাগুলি

৬৯ সাক্ষাৎকার গ্রহণ; সাক্ষাৎকার দিয়েছেনঃ মুহাম্মদ, মিজানুর রহমান; বয়সঃ ৫০; পেশাঃ কৃষি ও ব্যবসা। ঠিকানাঃ ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম; বাংলাদেশ; তারিখঃ ১৫/০৮/২০১৬ ইং

৭০ পরিশিষ্ট-II, ভারত ও বাংলাদেশ স্থল সীমানা চুক্তি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

৭১ *www.hcidhaka.gov.in*